বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনে পাঠদান পদ্ধতি

ড. সুব্রত কুমার কুরী
৯ আগস্ট ২০২১ ০৪:৩৫
পিএম | আপডেট: ৯ আগস্ট
২০২১ ০৪:৩৫ পিএম

প্রতীকী ছবি

advertisement

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ‘হটকেক’ টপিক হলো অনলাইন ক্লাস। সবাই নিজেদের আবেগ, যুক্তি দিয়ে অনলাইন ক্লাসের পক্ষে-বিপক্ষে বলছেন। আমি সবার যুক্তিকে সম্মান জানাচ্ছি। কারণ এগুলো নিজ নিজ ফিলোসোফিক্যাল এজাম্পসানের মাধ্যমে স্থাপিত। গত তিন বছরে আমি বিভিন্ন অনলাইন ক্লাসে পড়েছি এবং পড়িয়েছি। আর আমার গবেষণার মূল বিষয় এগ্রিকালচারাল এডুকেশন। তাই নিজের অভিজ্ঞতা এবং কিছু সায়েন্টিফিক গবেষণার ওপর ভিত্তি করে আজকের এই লেখা।

১. অনলাইন ক্লাসের সবকিছুই ভার্চুয়ালি হবে। এখন জুমে বা স্কাইপে সরাসরি ক্লাস সিডিউলে যে ক্লাস নেওয়ার কথা হচ্ছে, সেটা অনলাইন ক্লাস নয়। আমেরিকাতে জুমের ক্লাসগুলো অনসাইট হিসেবে কাউন্ট করা হয়, কারণ আপনাকে ফিজিক্যালি ক্লাসে থাকতে হবে, আপনার এটেন্ডেন্স হবে এবং ক্লাসে সরাসরি ইন্টারেক্ট হবে। কিন্তু এই পদ্ধতি ফিলিপড ক্লাসরুম এবং এন্ডাগগির ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে। অন্যদিকে অনলাইন ক্লাসরুম টোটালি অনলাইন, সরাসরি ভাব বিনিময় হবে না। প্রফেসর তার লেকচার বা স্লাইড একটি স্পেসেফিক প্লাটফরম, যেমন ক্যানভাস, ব্লাকবোর্ড, ফ্লিপগাড এ আপলোড করবেন এবং ছাত্রছাত্রী নিজেদের সুবিধামত ডেডলাইনের আগে সেগুলো সম্পন্ন করবে। আমার বোধমতে এটাই মূল তফাৎ। তাই জুমে ক্লাস নিলে আমাদের

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রচলিত আইনের কোনো পরিবর্তন আনার দরকার আছে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি না।

২. জুম বা অনলাইন ক্লাসে আমি কী পড়াব এবং কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে পড়াব? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই সমাধান করে নিতে হবে। শিক্ষা বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে একমত যে, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল ক্লাসরুম ফ্লিপড বা উল্টো হবে। কিন্তু এটা সায়েন্টিফিকালি প্রমাণিত। আসুন বুঝে নিই ফ্লিপড ক্লাসরুম কী।

আমরা ব্লুমস ট্যাক্সনমি বা রিভাইজড ব্লুমস ট্যক্সনমি কী তা সবাই জানি। যেখানে ছয়টা ধাপ থাকে যেগুলো হলো: রিমেমবারিং, আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এপ্লায়িং, এনালাইজিং, ইভালুয়েটিং, এবং ক্রিয়েটিং।

প্রথম তিনটি ধাপ নিম্ন স্তরের জ্ঞান এবং উপরের তিনটি ধাপ উপরের স্তরের জ্ঞানদান এবং অর্জনে সহায়তা করে। ফ্লিপড ক্লাসরুম হলো, ছাত্রছাত্রীরা বাড়িরকাজ হিসেবে নিজে নিজে নিম্নস্তরের জ্ঞানগুলো শিখে ফেলবে আর ক্লাসে এসে প্রফেসরের সহযোগিতা নিয়ে সহপাঠিদের সঙ্গে উচ্চস্তরের জ্ঞান আহোরন করবে। এখানে প্রফেসরের ভূমিকা প্যাসিভ বা গৌন। এখানে যে ক্লাসে যতবেশী আওয়াজ শোনা যায় সেই ক্লাস ততবেশী ইন্টারেক্টিভ আর যে ক্লাস যতবেশী নিড়িবিলি সেই ক্লাস ততবেশী বোড়িং। একটিভ ক্লাসরুম এন্ডাগগি ফলো করে। প্রফেসরের দায়িত্ব কোন ক্লাসে কী কী পড়ানো হবে, কীভাবে পড়ানো হবে, আর সেগুলোর রেফারেন্স কী সেই ফর্দ বা সিলেবাস বা কোর্স প্রফাইল ছাত্রকে দিয়ে দেয়া।

ছাত্র ক্লাসে আসার আগে সেই দিনের পাঠগুলো বাড়িতে পড়ে আসবে এবং তার ওপর নিজের মন্তব্য বা রিফ্লেকশন লিখবে। এটা নিম্নস্তরের কাজ। প্রফেসর চাইলে লেকচার নোট, ভিডিও রেকডেড স্লাইড শো, বা ভিডিও লেকচার ক্লাসের আগেই আপ্লোড করে দিবেন, যা দেখে ছাত্রছাত্রী নিজেদের পাঠ প্রস্তুত করবে। এর মধ্যে সমস্যা হলে প্রফেসরের সঙ্গে ই-মেইল বা অন্যকোনো যোগাযোগমাধ্যম যেমন স্লাক এ যোগাযোগ করে সমস্যা সমাধান করবে। আর ক্লাস এ অন্য কাজ যেমন গ্রুপ ডিস্কাসন, প্রেজেন্টশন, দলগত এসাইনমেন্ট ইতাদি কাজ করবে-যেগুলো উচ্চ স্তরের। এখানে প্রফেসর এর ভুমিকা কী? প্রফেসর শুরুতে লেকচার দিয়ে শুরু করলেও পুরো সেমিস্টার এর বেশিরভাগ সময় ফ্যাসিলিটেটর হবেন। ছাত্রকে নানবিধ সমস্যা দিবেন, সমাধানের সম্ভাব্য পথগুলো দেখিয়ে দিবেন। আর ছাত্ররা নিজের সেরা পথ খুঁজে নেবেন। এই পদ্ধতিকে কোঅপারেটিভ ক্লাসরুম বলে। এখন অনেকে বলতে পারেন এই পদ্ধতিতে সব থিওরি ক্লাস বা যেইসব প্রাট্যিকাল ক্লাস যাদের ল্যাবের যন্ত্রপাতি ব্যবহার লাগে না তাদের জন্য ফিজিবল হলেও বায়োলজিক্যাল সায়েন্স বা মাঠ গবেষণার জন্য ইফেক্টিভ নয়।

আমি এই যুক্তির সঙ্গে আংশিক একমত। এনিমেশন মুভি, যেমন টাইট্রেশনের এনিমেশন, আলুর অসমোসিস, মাইটোসিস বা মায়োসিসের স্লাইড গঠন পদ্ধতি, পশুর এনাটমি, মিট বা ডেইরি প্রসেসিং এর ধাপগুলো, সায়েল লেয়ার, ইন্সেক্ট ডিসেকসন, এগুলো কিন্তু এনিমেশশের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে। আবার মাঠ গবেষণা যেমন এগ্রনমির ধান চাষ বা হর্টিকালচারের ঢেড়স চাষাবাদ পদ্ধতি কিন্তু ছাত্ররা নিজের বাড়িতে করতে পারে এবং এ অনুযায়ী রিপোটং করবে। অনেকে বলবেন ছাত্ররা হয়ত অন্যকাউকে বিয়ে এগুলো করিয়ে নিবে। এটা সত্য হতে পারে আবার নাও পারে। এই সত্যটি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ গবেষণাগার গুলোর জন্যও সত্য হতে পারে, আবার নাও পারে। আমার বিশ্বাস আমরা যদি ছাত্রদের বিশ্বাস করা শুরু করি, তাহলে তারাও আমাদের বিশ্বাসের মর্যাদা দিবে। তবে ফিজিক্যকল ল্যাবের কোনো এক্সাট বিকল্প নেই, অনেকটা মায়ের দুধের মতো।

৩. জুম বা অনলাইন ক্লাসের সবচেয়ে কঠিন ধাপ হলো পাঠমূল্যায়ন। আমাদের দেশের সবাই পরীক্ষা নিয়ে সচেতন। বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রফেসর দেখলাম চৌকিতে মোবাইল বেধে অনলাইনে পরীক্ষা নিতে বলছেন। আমি এ বিষয়ে একমত নই। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সেদিন খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন, এক বছর এক্সাম না হলে ছাত্রদের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে না। আমি উনার এই কথাকে সাধুবাদ জানাই। উনি আমার মনের কথা বলেছেন।

আমি ভার্জিনিয়া টেকে ১৬টির মতো ফরমাল ক্লাস করেছি, যার একটি মাত্র ক্লাসে আমাদের মতো ফাইনাল এক্সাম ছিল। বাকি ক্লাসগুলোতে নামেমাত্র ফাইনাল এক্সাম। একটা পেপার লেখা, প্রেজেন্টেশন দেওয়া এসব ছিল। কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি প্রত্যেক ক্লাসের পড়া এখনো আমার মাথায় আছে। কিন্তু আমি আমার বাকৃবির আন্ডারগ্রাড বা মাস্টাস এর পড়া মনে করতে পারি না; পুরোনো বই, নোট, আর লেকচার শীট দেখে মনে করা লাগে।

যাই হোক, তাহলে অনলাইন ক্লাসের পাঠমূল্যায়ন কেমন হবে। পাঠ মূল্যায়ন দুই রকম: সামেটিভ বা সেমিস্টারের শেষে একবারে মূল্যায়ন আর ফরমেটিভ বা ধারাবাহিক মূল্যায়ন। আমরা এখন সামটিভ মূল্যায়ন করলেও জুম বা অনলাইন ক্লাসে ফরমেটিভ মূল্যায়নের বিকল্প নেই। উদাহরণ দিচ্ছি: আমি এখানে ফাইনাল ইয়ার এর একটা সাবজেক্টে পড়াতাম এবং আমার মুল্যায়ন পদ্ধতি ছিল এরকম: সাপ্তাহিক পাঠের মন্তব্য মূল্যায়ন ১৫%, তিনটা গ্রুপ এসাইনমেন্ট: ৬০%, ফাইনাল এক্সাম বা এসাইনমেন্ট ১০%, আর নিজমূল্যায়ন আর এটেন্ডেন্স ১৫%।

ছাত্ররা ১৬টা উইকলি রিফ্লেকসন সাবমিট করেছিল। গ্রুপ এসাইনমেন্টগুলো ছিল সবচেয়ে কঠিন, তারা তিনটা ভিন্ন ভিন্ন পেপার জমা দিয়েছিল এবং প্রেজেন্ট করেছিল। নিজেরা মাঠ থেকে ডাটা কালেকশন করে এই রিপোর্ট জমা দিয়েছিল এবং তারা বেশিরভাগ ডাটা কালেকশন অনলাইন বা টেলিফনে করেছিল। ফাইনাল এসাইনমেন্ট খুব রিল্যাক্স ছিল। ওদেরকে দিয়ে নিজেদের কাজের ওপর একটা প্রবন্ধ লেখা লেগেছিল আর ভিডিও রিফ্লেকসন ছিল এরকম এই ক্লাস করার পর তার জ্ঞানের কী চেঞ্জ এসেছে। এ ছাড়া পিছিয়েপড়া ছাত্র বা মনোযোগী ছাত্রদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য বোনাস পয়েন্ট রেখেছিলাম। নিজ মূল্যায়ন হচ্ছে ছাত্ররা নিজেদেরকে নিজেরা মূল্যায়ন করেছিল তাদের পারফমেন্সের ওপর এবং এটেন্ডেন্স কিন্তু ক্লাসে আসলেই নম্বর দিয়েছি, এরকম নয়। তাদের ক্লাস এক্টিভিটির ওপর এই নম্বর ছিল। এই মূল্যায়ন কিন্তু সারা সেমিস্টার ধরে চলেছিল এবং ছাত্ররা বেশীরভাগ ক্লাসে মনোযোগি ছিল। ২০% ছিল দুষ্টু প্রকৃতির, এদের পেটব্যথা, জ্বর, গাড়ি নষ্ট, বাসায় নেট প্রব্লেম এসব ছিলই। এই ফরমেটিভ এভাল্যুয়েশন এ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছাত্র দুই উপকৃত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শাখার দরকার পরেনি, খাতা দেখার পারিতোষিক দেওয়া লাগেনি, লাগেনি এক্সটা পেপার কস্ট। অন্যদিকে ছাত্ররা একবারে কোনো পেশার অনুভব করেনি। সারা বছর এক্টিভলি এটেনটিভ ছিল, জ্ঞানের রিটেনশন খুবই মজবুত। আমার বাকৃবির ফাইনাল ইয়ারের ক্লাসে আমার ছাত্রদের এগ্রিকালচারের ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করতাম, সবাইকে। শতকরা ৫% থেকে ১০% এক্সেপ্টেবল উত্তর দিতে পাড়ত, বাকিরা সঠিক উত্তরের ধার দিয়ে যেতে পারেনি। আমি প্রায় ৪ বছরে চারটা ক্লাসে এই টেস্ট করেছি, ফলাফল একই। আপনারা কেউ চাইলে টেস্ট করে দেখতে পারেন।

৪. অনলাইন বা জুমে ক্লাস করতে কী কী লজিস্টিক লাগে? খুব সামান্য তবে জানিনা আমরা কতটুকু দিতে পারব। ছাত্র-শিক্ষক সবার জন্য কম্পিউটার বা কিবোডযুক্ত ট্যাব, ইন্টারনেট (মিনিমামা থ্রিজি) এবং অনলাইন ফাইল স্টোরেজ প্লাটফরম যেমন ক্যানভাস, ব্লাকবোর্ড। এটা গুগল ড্রাইভ দিয়ে প্লাটফর্ম সমস্যা রিপ্লেস করা যাবে।

পাদটিকা : বিশ্ববিদ্যালয় যদি মনে করে, তবে আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারি। আমরা বিনামূল্যে ১০ দিনের একটা অনলাইন ক্লাসের ট্রেনিং করতে পারি, যেখানে আমরা সবাই ছাত্র হয়ে যাব। নিজেরা যেভাবে শিখব, ভালো মনে হলে ক্লাসে সেভাবে পড়াব। আমাদের বাইরে থেকে টাকা দিয়ে এক্সপার্ট ট্রেনার আনার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। ক্লাসরুমে স্ট্যাটাসের ফারাক থাকলে গুণগত শিক্ষা লাভ হয় না।

ড. সুব্রত কুমার কুরী : সহকারী অধ্যাপক, কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়